টিনের তলোয়ার

উৎপল দত্ত

শ্রেণীবিচার ঃ

সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম হল নাটক। সাহিত্যের মতো নাটকেরও দেশ কাল, সমাজ বিচ্ছেদ হতে পারে না, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা বলতে গিয়ে নাটক-ই অনেক সময় রাজনীতির আঙিনায় এসে পড়ে। উৎপল দত্ত রচিত 'টিনের তলোয়ার' নাটকের পটভূমি হিসাবে নাট্যকার বেছে নিলেন প্রায় ১০০ বছর আগের সময়কে — ১৮৭৬-এর কাছাকাছি। আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমরা তৎকালীন সময়ের ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব।

'টিনের তলোয়ার' যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক। ১৮৭২ সালের সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে জনসাধারণের কাছে রঙ্গমঞ্চের দরজা খুলে যায়। দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটে তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজজীবনে। নাটকই তখন দেশাত্মবোধ জাগরণের অন্যতম মাধ্যম। বাস্তবিক কারণেই ইংরাজ সরকার এই প্রভাবশালী মাধ্যমটির উপর আঘাত হানল। ১৮৭৬ সালে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চালু হল। একদিকে শাসকদলের এই দমন পীড়ন মূলক নীতি এবং অন্যদিকে তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যেও নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের নাটক ও থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস রচনা করল। এক নতুন সংগ্রামের ইতিহাস শুরু হল। উৎপল দত্ত এই ইতিহাসকেই করেছেন তাঁর নাটকের পটভূমি।

'টিনের তলোয়ার' নাটকে একাধিক স্তর লক্ষ্য করা যায়। 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে একদা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তার অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে এই নাটকের মত একাধিক নাটক নিষিদ্ধ হয়। ১৮৭৬ সালে এবং তার আগে পরে কলকাতার প্রধান নাট্যগোষ্ঠী ছিল ন্যাশানাল থিয়েটার, হিন্দু থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশানাল অপেরা। উৎপল দত্ত এই সময়ের পটভূমিতে নাটকে স্থাপন করলেন গ্রেট বেঙ্গল অপেরা নাট্যদল, যার অভিনেতা-অভিনেত্রী হল — বেণীমাধব (কাপ্তেন), হরবল্লভ, প্রিয়নাথ, গোবর, যদুগোপাল, নটবর, বসুন্ধরা (আঙুর), কামিনী (সেমারা)। নাটকের সূচনা দৃশ্যে মঞ্চ জোড়া এক বিরাট লোগোরও দেখা যায়।

আবার 'টিনের তলোয়ার' নাটকে আলোচিত হয়েছে গ্রেট বেঙ্গল অপেরার অ্যাকট্রেস মানদাসুন্দরীকে গ্রেট ন্যাশানালের কর্মচারীরা ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। বাদিবাটির আলু হাসনাদের বেগুন বেচে যে চালায় রাস্তার মেয়ে ময়নাকে কাপ্তেনবাবু কুড়িয়ে আনলেন শোভাবাজারের ফুটপাত থেকে। মানদাসুন্দরীর স্থান নেবে ময়না। ময়নাকে অভিনেত্রী করে তোলার উদ্যোগের পিছনে সে-কালে অধিকাংশ অভিনেত্রীর জন্ম ইতিহাস লুকিয়ে আছে। তবে ময়নার রূপান্তরের মধ্যে পিগম্যালিয়ন নাটকের সামান্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীগ্রহণ ও তৎকালীন 'প্রতিক্রিয়া' নিয়ে দর্শন চৌধুরী তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। পতিতাপল্লি থেকে অল্পবয়সী মেয়েদের এনে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাদের দিয়ে মঞ্চাভিনয় করিয়েছেন অর্ধেন্দুশেখর, বেলবাবু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল। 'টিনের তলোয়ার' নাটকে ময়না পড়ে শুনিয়েছে, অনেকানেক ভদ্রজনের সামনে এদের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির কথা। সেই সময়ের অর্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্রের মতো ভূমিকা নিয়েছে টিনের তলোয়ার নাটকের বেণীমাধববাবু। তিনি পাথরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন, কাঠপুত্তলির চক্ষু উন্মীলন করে দিতে পারেন, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে পারেন। তিনি শিক্ষক, তিনি স্রষ্টা।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে সে সময়ে প্রায়ই দেখা গেছে দল-বদল, বিশেষত অভিনেত্রী ভাঙিয়ে নেওয়া'র কথা। যদুমণি, কাদম্বিনী কখনও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে, কখনো নতুন-দল গ্রেট ন্যাশনাল অপেরায়, বিনোদিনী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে বেঙ্গল থিয়েটারে। তাই আমরা সহজেই বলতে পারি, 'টিনের তলোয়ার' নাটকে রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা নাট্যকার যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন।

'টিনের তলোয়ার' নাটকটি যেমন একদিক থেকে ঐতিহাসিক, তেমনি অন্যদিক থেকে রাজনৈতিক। এই নাটকের ঘটনা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে রাজনৈতিক প্রত্যয় ধরা পড়েছে। শাসকশ্রেণী চিরকালই গণমাধ্যমকে গিলে ফেলতে চায়। ১৮৭২-এর পরবর্তী সময়ে যখন নাটকের মধ্যে পরাধীন জাতির দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটছে তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি পড়ে নাটকের ওপর। এদেশে তখন ছিল একশ্রেণীর সমাজপতি (বীরকৃষ্ণ দাঁ বাচস্পতি যাদের প্রতিনিধি)। তারা থিয়েটারকে নিজেদের হস্তগত করে রাখার জন্য সর্বদাই মদত দিত ইংরাজদের। তাই এই নাটকের প্রারম্ভে উৎপল দত্ত প্রণাম জানিয়েছেন সেইসব নাট্যপ্রেমী মানুষদের যারা নাটকের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

আপাতদৃষ্টিতে এই নাটকটিকে সমকালীন সমাজের ছবি মনে হলেও নাটকটি সমাজের চিত্র হয়েও ব্যাপক অর্থে তা তুলেছে রাজনৈতিক আদর্শকে। উৎপল দত্তের লক্ষ্য ছিল বীরকৃষ্ণের মতো মুৎসুদ্দি শোষককে সকলের সামনে তুলে ধরা, বাচস্পতির সমাজ অত্যাচারকে দেখানো। বীরকৃষ্ণ, ময়ূরবাহন নাটক না হলে তুলে দিতে চান দলকেই, বাচস্পতি মহিলা অভিনেতা নিয়ে বেশ্যাগিরি করবার অভিপ্রায়ে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এসব নিছক সমাজের ছবি নয় বরং শোষণের কৌশল।

নাটকের প্রথমেই 'ময়ূরবাহন' নাটক আসার বিজ্ঞাপনটিও নাটকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তা একটি সমাজের জীবনভাষ্য। আসলে শোষক শ্রেণীর

একটি চিরকালীন লক্ষ্য হল অতীতে শিক্ষা-সাহিত্যের ঐতিহ্যকে আড়ালে রেখে জনমানসে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। নাটকের বিত্তাসনটিতে সেই অতীতের জাজ্বল্যমান ধারাকেই যেন নাড়িয়ে দিয়েছে বারে বারে।

নাটকের চতুর্থ অধ্যায়ে দুর্দশা কবলিত বাংলাদেশের কথা এসেছে। প্রিয়নাথ ময়নাকে বলছে — "ডু ইউ নো হোয়াট্‌স হ্যাপেনিং" কেন এই দুর্ভিক্ষ ..... দে আর এক্সপোর্টিং, জুড়ে আমাদের খাদ্য — চাল, গম, চিনি সব রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে। রেশমশিল্প ধ্বংস করেছে, তাঁতিদের উচ্ছেদ দিয়েছে। খাদ্য অন্ন কেড়ে নিয়ে সব চালান করে দিচ্ছে বিদেশে। --- তাই দুর্ভিক্ষ" এটি প্রত্যক্ষ ভাবেই রাজনৈতিকতার ছবি। আবার ইংল্যান্ডের যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমনকে কেন্দ্র করে গ্রেট ন্যাশনাল হল অভিনয় করল — নাটক 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' সহ বেশ কয়েকটি নাটককে অশ্লীলতা ও রাজদ্রোহ দোষে দুষ্ট করে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের বলে নিষিদ্ধ করা হল। এর সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করা হল। এইসব ঘটনা নিছক সমাজ বা ইতিহাসের নয় বরং অনেকাংশেই রাজনৈতিক। তাই পুলিশ অফিসার ল্যামবার্ট-এর উপস্থিতিও নাটকে দেখি। তাই দেখি সধবার একাদশী' অভিনয় চলার সময় 'তিতুমীর' নাটকের দৃশ্যসজ্জায় মুহূর্তে পালটে যায়।

এই নাটকে বেনীমাধব অর্থাৎ বাংলার গ্যারিকের সঙ্গে কলকাতার এক মেথরের চেনাশোনা হল। তার সঙ্গে নাটক বা থিয়েটারের কোনো যোগ নেই। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার গ্যারিককে চেনবার কোনো আগ্রহই তার থাকবে না। মেথরের ঘৃণা তাকে অনেকটা সমাজের নীচু শ্রেণীর কাছাকাছি এনে দিয়েছে। মেথরের মুখে শুনি — "কই যুবরাজ ছেড়ে আমাকে নিয়ে নাচতে পারবে?" বেনীমাধব এভাবেই জনমানসকে জেনেছে। তার হাতে তিনি ময়নাকে তুলে দিয়েছেন নাটকের জন্যে। এর থেকে শোষকশ্রেণীর একটা চরিত্র ফুটে ওঠে এদের তাদের হাত থেকে নাটককে বাঁচানোর সতত চেষ্টাও চোখে পড়ে। এই বেনীই নাটকের শেষাংশে প্রকাশ্যে ল্যাম্বার্ট সাহেবের সামনে তিতুমীরের চরিত্রে অভিনয় করে। অর্থাৎ সে যথার্থই শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রতীক।

প্রায় সমস্ত দিক বিচার করে আমরা 'টিনের তলোয়ার' নাটকটিকে যথার্থই রাজনৈতিক নাটক বলতে পারি।